একক ৪৯ ❐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাঁচটি কবিতা

গঠন

৪৯.১ উদ্দেশ্য
৪৯.২ প্রস্তাবনা
৪৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত
৪৯.৪ মূলপাঠ — ১ সোনার তরী
৪৯.৫ সারাংশ — ১
৪৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৪৯.৭ মূলপাঠ — ২ শতাব্দীর সূর্য আজি
৪৯.৮ সারাংশ — ২
৪৯.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৪৯.১০ মূলপাঠ — ৩ ঃ তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে
৪৯.১১ সারাংশ — ৩
৪৯.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৪৯.১৩ মূলপাঠ — ৪ ঃ উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
৪৯.১৪ সারাংশ — ৪
৪৯.১৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৪৯.১৬ মূলপাঠ — ৫ ঃ অমৃত
৪৯.১৭ সারাংশ — ৫
৪৯.১৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৪৯.১৯ উত্তরমালা
৪৯.২০ গ্রন্থপঞ্জি

৪৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সত্তর বৎসরের কাব্য জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। কবিতাগুলিতে কবির নিজের পরিবার, দেশ, সমাজ ও সমকাল থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিপুল ভাবসম্পদ নিয়ে তিনি অসামান্য শিল্প সৃষ্টি করেছে, তার পরিচয় পাবেন। তাই কবিতাগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি —

- ১৯ শতকের শেষার্ধে রচিত আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম পর্যায়ের রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগ থেকে পরিণত কবিমানসের পরিচয় লাভ করবেন।

- গীতিকবিতার বিশেষত রবীন্দ্র-গীতিকবিতার বিবর্তন ধারাটির সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত হবেন।
- রবীন্দ্র-কবিতাপাঠের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আপনার মতামত গড়ে তুলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গীতিকবিতার গঠন সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাঠ্য কবিতাগুলি থেকে অর্জন করা সম্ভব হবে।

৪৯.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন দুটি শতাব্দীকে স্পর্শ করে আছে। ১৯ শতকের পরার্ধ আর ২০ শতকের প্রথমার্ধ এ দুটি পর্বই নতুন যুগের ভাব আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে একটিতে নব নব সৃষ্টির উল্লাসে মাতোয়ারা, অপরটিতে পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও যুগযন্ত্রণার সংশয় ও আর্তিতে সমকালী শিল্পীমানস পুরাতনের ওপর দাঁড়িয়ে নতুনের সন্ধানে ব্যাকুল।

রবীন্দ্রনাথ আপন পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করে, তাঁর কবি-আত্মাকে সদা সতর্ক ও জাগ্রত রেখেছেন। মহর্ষি পিতার সান্নিধ্য—তাঁর আবেগ ও মননে ঔপনিষদিক বোধ সঞ্চারিত করেছিল। পরিণত রবীন্দ্র হয়ে উঠেছেন 'কবিমনীষী'। তিনি কবি হয়েও ছিলেন 'ঋষি' আর 'ঋষি' হয়েও জীবনশিল্পী। আচার্য সুকুমার সেনের কথায় "রবীন্দ্রনাথ সর্বভূমির, বিশ্বজীবনের কবি, "কবীনাং কবিতমঃ।" তাঁর মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে, দুঃখ-সুখে, জীবনে-মরণে সমদৃষ্টিমান, জীবন-ভাবক কবি মানুষের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গেছে। তিনি জগৎ জীবনকে, তার সৌন্দর্য-মাধুর্যকে নিজের চিন্তন ও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই মানবসম্পদকে তিনি অনবদ্য শিল্প-সাধনায় সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। মানবমনের এই ভাব-ঐশ্বর্যকে ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ ভাষায় নানা ধারায় ও রূপে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্র কবি-জীবনের এই কল্পনাসম্ভারকে স্পর্শ করবার একান্ত বাসনায় বর্তমান এককের পাঁচটি কবিতার পরিকল্পনা। এই কবিতা পঞ্চক কবির কাব্য জীবনের বিবর্তনের দুটি পর্বের পাঁচটি পর্ব থেকে নির্বাচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কবিমানস সম্পর্কে আপনার একটি সাধারণ বোধ জন্মাবে। এই উদ্দেশ্যেই 'সোনার তরী', 'নৈবেদ্য', 'বলাকা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' থেকে একটি করে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এগুলি সবই গীতিকবিতা—কবির মনের একান্ত ভাবনার ফসল। গীতিকবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রথম এককে আছে। এখানে 'মূলপাঠে'র পর সারসংক্ষেপে কবিতার বিষয়বস্তু ও কবিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কিছু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কবিতাকে সমগ্রত বোঝাবার জন্য। কবিতাগুলি পূর্বাপর পাঠে অনুশীলনীগুলি সাহায্য করবে।

৪৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (ইং ৭ই মে, ১৮৬১খ্রিঃ)। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মায়ের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র।

বাড়িতেই প্রথমে তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিনের জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়েছেন। শৈশবেই কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রকাশিত কবিতা "হিন্দু মেলার উপহার" (১৪ ফাল্গুন, ১২৮১, ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। এটি দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'ভারতী'তে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। 'কবিকাহিনী' (১২৮৫, ইং ১৮৭৮) ও 'বনফুল' (১২৮৭, ইং ১৮৮০) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত গিয়ে, কিছুদিন ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে পড়ার পর, তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মাস তিনেক অধ্যাপক মর্লির কাছে পাঠ নেন। ১৮৮০-র ফেব্রুয়ারিতে কোনো পাঠক্রম শেষ না করেই দেশে ফেরেন। বাড়িতে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জোর গানের আসর বসছে। এই পরিবেশে গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১) অভিনয়ের আয়োজন হয়। এরপর একের পর এক তাঁর কাব্য, নাটক ও উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে।

৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ কবির বিয়ে হয়। ১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৪ কবির কৈশোরের সাহিত্যসঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দেবেন্দ্রনাথের বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদের মৃত্যুতে জমিদারি দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ওপর বর্তায়। এ সময় তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। মাঘোৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত, ব্রাহ্মমতের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখা, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হিন্দুত্ব নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো নানা ঘটনা ঘটে। আর জমিদারি দেখার ফাঁকে 'হিতবাদীর' সাহিত্য সম্পাদকের দায়ে ওই পত্রিকায় পরপর ৬টি গল্প লেখেন—সার্থক বাংলা ছোটোগল্পের সূচনাও এখানেই। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে এ সময় গ্রামবাংলার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ চিঠিগুলি লেখেন, তারই গ্রন্থনা 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলী'। 'সোনার তরী' (১৩০০ইং ১৮৯৪) এই পর্বেই লেখা। ১৯০১-এ 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। ওই বৎসরেই বোলপুরে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বা 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা, এটি ১৯২১-এ বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে স্ত্রীবিয়োগ ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যু। ১৯০৭ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত কবি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) রচনা করেন। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনার স্মৃতিতে তিনি 'স্মরণ' (১৯১৪) রচনা করেন। ইতোমধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-এ দেশবাসী কবিকে সম্বর্ধনা জানায় (১৯১২, ২৮শে জানুয়ারি)। অক্টোবর, ১৯১৩ ইংরেজি 'Song offerings' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে।

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' (১৯১৪) "সবুজের আহ্বান" কবিতা প্রকাশ। এ সময়েই রচিত কবিতার নতুন বাণী, নতুন ছন্দ 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই নতুন ধারা বাংলা কাব্যে নতুন শৈলী ও ভাবনা নিয়ে এসেছে। ১৯১৯-র জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করলেন। মে ১৯২০ থেকে জুলাই ১৯২১ বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে 'বিশ্বমৈত্রীর' কথা প্রচার করে বেড়ালেন। এ সময়েই 'বিশ্বভারতীর' সূচনা। দেশে তখন চলছে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন। নানা দেশের আমন্ত্রণে কবিকে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণে যেতে হয়। পেরুর স্বাধীনতা যুদ্ধে শতবর্ষ উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি বুয়েনোস এয়ারিসের শহরতলিতে কবিভক্ত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ করেন (১৯২৪)। তাঁকেই কবি বিজয়া নাম দিয়ে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ (১৯২৫) উৎসর্গ করেন। দেশে ফিরে গান্ধিজির চরকা ও খদ্দর নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এ প্যারিসে কবির প্রথম চিত্র প্রদর্শনী

হয়। তিনি অক্সফোর্ডে হির্বাট বক্তৃতাও দেন। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। ১৯৩২ গদ্যছন্দে কাব্য রচনার সূচনা করলেন, 'পুনশ্চ' (১৯৩২) প্রকাশিত হল। ১৯৩৫ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ ওসমানিয়া, ১৯৪০-এ অক্সফোর্ড (শান্তিনিকেতনে এসে) কবিকে ডি.লিট. উপাধি দেন। এই বৎসর কবি প্রায় একমাস শয্যাগত থাকেন। এর মধ্যে লেখেন 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) 'আরোগ্য' (১৯৪১) ও 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। মাঝে একটু সেরে উঠলেও, আবার অসুস্থ হলে কলকাতায় এনে তাঁকে অস্ত্রোপচার করা হয় (৩০ শে জুলাই, ১৯৪১), সেদিনই করি শেষ রচনা 'তোর সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'। অবশেষে ৭ই আগস্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

একাশি বছরের জীবনে প্রায় আটষট্টি বছর সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিতা-কাব্য রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রকাব্য বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। তিনি বাংলা কাব্যকে বাংলা ভাষার অন্তরশক্তি, ভাবমহিমা কল্পনালীলা ও ছন্দোগৌরবে, দেশকালের প্রেক্ষিতে মনন-চিন্তা-অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করে আধুনিক মনের উপযোগী করে তুলেছেন। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর একটি বিবর্তনসূত্র আছে, সেগুলিকে কয়েকটি পর্বে চিহ্নিত করা যায়। 'কবিকাহিনী', 'বনফুলে' কবির কাব্যচর্চার হাতে খড়ি। প্রথমপর্ব বা শিল্পিত কাব্যধারার সূচনা 'সন্ধ্যা-সংগীত' (১৮৮২), 'প্রভাত-সংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) থেকে ধরা হয়। এগুলির মধ্যে কবির কৈশোর-কল্পনা, ক্রমশ অস্পষ্ট কুহেলিকা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথসন্ধানী বলা যায়। একটি অনির্দেশ্য প্রেমানুভূতি এসময় কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ-খোঁজায় ব্যাকুল দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্বে যার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাওয়া গেল 'মানসী' (১৮৯০) 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬) ও 'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যে। কবি এ সময় লীলাচপল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যমাধুরীর সঙ্গে কালিদাসের তথা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সৌন্দর্য লোকে বিচরণ করে, দেশকালের আবহমানতায় নির্মিত স্বকীয় কবিসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে চিরন্তন সৌন্দর্য জগৎকে খুঁজে পেয়ে, নবতন আত্মোপলব্ধির আনন্দ হর্ষ-বিষাদ, কল্পজগৎ আর বাস্তবজগৎ একাকার হয়ে কবিতায় নতুন ভুবন রচনা করেছেন। চিত্রকল্পে, শব্দযোজনায়, কাব্যছন্দে, সে পরিচয় আছে। এই সময়ের 'সোনার তরী' শীর্ষক কবিতা দ্বিতীয় পর্বের 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। সোনার তবী কাব্যে প্রথমে দেখি রহস্যময় সৌন্দর্য জগতের মধ্য থেকে উঠে আসা কতকগুলি প্রশ্ন কবি চিত্তকে পীড়িত করছে। বাস্তব পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, আর সৌন্দর্য জগতের ঊর্ধ্বগত আকাশে বিহারের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সৌন্দর্যের জগতে নিরুদ্দেশ যাত্রার অমোঘ আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেছেন। এই জিজ্ঞাসা থেকেই কবির 'জীবন-দেবতা' ধারণার সূচনা।

তৃতীয় পর্বে কবি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মভাবে জগতে বিচরণ করেছেন। জীবন দেবতা কল্পনা ও বিশ্বানুভূতি, ভগবৎ-ভক্তি, ব্যক্তিসত্তার অতীত রহস্যময়ী নিয়ন্ত্রী শক্তির পরিচয় পেয়ে এক সময় কবি মনে যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল, তা-ই কবিতার প্রেরণা হয়ে দেখা দিল। প্রকাশিত হল — 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'খেয়া' (১৯০৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি' (১৯১৪) কাব্য। শেষোক্ত কাব্যত্রয়ী গীতিধর্মী। উপরের সবকটি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতাও নির্বাচিত গানের কবির স্বয়ংকৃত ইংরেজি অনুবাদ W.B. Yeats-এর ভূমিকাসহ Gitanjali (Song offerings) (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এখানে কবির বিশ্বানুভূতি থেকে অসীম বা 'ভূমা'র ভাবনার সূত্রপাত। ভূমা কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণে নয়, প্রকৃতির সীমাহীন রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর লীলাচঞ্চল পরিক্রমা। এ পর্বের ভিন্নতর রসের একটি কবিতা নৈবেদ্যের 'শতাব্দীর সূর্য' মূল পাঠের বিষয়।

চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে সুস্পষ্ট দিক পরিবর্তন ঘটেছে। 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া' (১৯২৯) এই তিনটি কাব্য নতুন জীবনদর্শনের পরিচয়বাহী। এতদিন ছিল বস্তু বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীত সত্যের সন্ধান, প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় সীমা থেকে অসীমে যাত্রা এবার অসীম থেকে সীমাকে দেখা, বিশ্বজীবনের উপলব্ধি থেকে বস্তুজগৎকে দেখা—অর্থাৎ ভৌমচেতনা থেকে বিশ্বচেতনা, এবার বিশ্বচেতনা থেকে ভৌম জগৎকে দেখা। তাই কবি এ পর্বে অনেকটা প্রাজ্ঞ-দার্শনিক, মননশীল জীবনদ্রষ্টা। তিনি পুরাতনকে নতুনরূপে দেখেছেন, পুরাতন যৌবনোজ্জ্বল আবেগঋদ্ধ প্রেমানুভূতির পরিবর্তে অনেক শান্ত ও সংযত, আদর্শনিষ্ঠ। এই দার্শনিক ভাবানুভূতি তাঁর ছন্দ রীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বলাকার এই নতুন ভাবরাশি, নতুনতর ছন্দের অনিয়মিত, অসম ছত্রের মুক্তক ছন্দে অভিব্যক্তি পেয়েছে। 'বলাকা'র 'তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে' (শঙ্খ) কবিতা এককের মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্য মুক্তকে রচিত নয়।

পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি — 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) 'পত্রপুট' (১৯৩৬) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থকে পুনশ্চবর্গের কাব্যগ্রন্থ বলা চলে। পুনশ্চতেই গদ্য কবিতার সূচনা, 'শ্যামলী' পর্যন্ত এই গদ্য কবিতার বিস্তার এবং কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। রবীন্দ্রকাব্যধারার যে সামান্য পরিচয় ইতোমধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে এটি লক্ষণীয় যে তিনি সর্বদাই, তাঁর অতীত ও কীর্তিকে অতিক্রম করে নিত্য নতুন পথে অজানার সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। সত্তর অতিক্রান্ত কবি বিচিত্র ভাব ও রূপচর্চার মধ্য দিয়ে কাব্যশিল্পের চরমোৎকর্ষে পৌঁছেও তৃপ্ত নন। এই অতৃপ্তির বেদনা থেকেই 'তিনি হঠাৎ ছন্দোহীন ও গদ্যছন্দে প্রসাধনবর্জিত, কল্পনার ঐশ্বর্যরিক্ত কবিতা রচনা' করলেন। এ পর্বে তিনি ছন্দোমোহ সৃষ্টির পরিবর্তে, 'অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও ব্যাকুলতায় কাব্যের নিগূঢ় আবেদন পাঠক চিত্তে' সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ পর্বের কবিতায় কোনো বিশেষ জীবন দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রবণতা হলেও, কবিতা তার নিজস্ব ভাবগরিমা, বিষম-গৌরব ও কল্পনার মহনীয়তায় হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ এভাবে এ পর্বের কাব্যগ্রন্থে ন্যূনতম অলঙ্কার প্রয়োগে প্রধানত ভাবসৌন্দর্যের ওপর নির্ভর করে কাব্যরচনার পরীক্ষা করে যে ধারাটির সূচনা করেছেন, তা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের দ্বারা বহুচর্চিত হয়েছে। এককের ৪র্থ ও ৫ম মূলপাঠের জন্য নির্বাচিত দুটি কবিতা যথাক্রমে পত্রপুট ও শ্যামলী থেকে গৃহীত হয়েছে।

ষষ্ঠ বা শেষপর্বের কাব্য 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' এবং 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শেষলেখা' (১৯৪১)। প্রথমোক্ত চারটি কাব্যগ্রন্থ কবি কল্পনার শিথিল, এলায়িত ভঙ্গি ; অসংবৃত বস্তুপুঞ্জের ভারে আপাতভাবে দুর্বল মনে হলেও পরবর্তী মুহূর্তে কাব্যের অন্তর্নিহিত রূপটিকে "গদ্যছন্দের স্মৃতিবাহী সহজ সরল ছন্দ প্রয়োগে" ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু 'রোগশয্যায়' থেকে 'জন্মদিনের' কবিতাগুলিতে রোগজীর্ণ কবি যেন আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছেন এবং তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রূপাতীত সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত্যুকে স্বীকার করেও তিনি জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাস ব্যক্ত করেছেন। শেষপর্বে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিশ্বাস, স্বার্থপর লোভীদের প্রতি ভর্ৎসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। এ সময় শব্দচয়নে, চিত্ররচনায়, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কবি রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যাকুলতার পরিবর্তে, নিরাসক্ত, তির্যক, ক্বচিৎ বিবর্ণ, তীব্র বাগ্‌বিন্যাসে ভিন্নতর রূপ রীতির সৃষ্টি করেছেন। 'রোগশয্যায়' কাব্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দৃষ্টির মমতা নিয়ে দেখা জীবনের যে সূক্ষ্ম ও সত্যরূপ এবং বিভীষিকা ও অসংলগ্ন চিন্তা ভারাক্রান্ত মনের উদ্ভট দুঃস্বপ্ন-পীড়িত অনুভূতির এরকম আবেগময় শিল্পসম্মত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এরই সঙ্গে আছে 'আরোগ্য' রোগমুক্তির স্বস্তি, আনন্দানুভূতি। 'জন্মদিনে' পৃথিবীর প্রতি কবির প্রসন্ন বিশ্বাসের কথা রূপায়িত হয়েছে।

কাব্যকথা প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'জন্মদিনে' পর্যন্ত কাব্য ও কবিমানসের এই পরিচয় থেকে এককের পাঁচটি কবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব হবে আশা রেখেই এই পরিক্রমা।

৪৯.৪ মূলপাঠ — ১ ঃ সোনার তরী

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে, খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়মসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে॥
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে—

বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও—
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে॥

যত চাও তত লও তরণী' পরে।
আর আছে ?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এত কাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে॥

ঠাঁই ঠাঁই, ঠাই নাই — ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছ ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

শিলাইদহ। বোট
ফাল্গুন ১২৯৮

৪৯.৫ সারাংশ — ১

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অবিরাম বর্ষণ থেকে ক্ষণিক ক্ষান্তির মুহূর্ত। এরই মধ্যে এক কৃষক নদীর ধারে একাকী বসে আছে, কোনো ভরসা নেই। জলভরা খরস্রোতা নদী, দুর্বার বেগে বহমান। তার চারিদিকে রাশি রাশি বোঝাই কাটা ধান।

ছোটো খেতের ধারে একলা বসে, তখন পরপারের তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামটি আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছিল। দূর থেকে গান গাইতে গাইতে কে যেন আসছে, দেখে মনে হল সে যেন চেনা। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে পালতোলা নৌকায় ঢেউ তুলে কোথায় চলেছে। কৃষক মাঝিকে কাতর কণ্ঠে কূলে নৌকা ভেরাবার জন্য অনুরোধ করল। তার কেটে রাখা সোনার ধান তুলে নিয়ে তারপর সে যেখানে ইচ্ছা যাক—এটাই একান্ত ইচ্ছা।

অনুরোধ মত নৌকায় সমস্ত তুলে দিয়ে তাকে করুণা করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলায় উত্তরে 'ঠাঁই নেই' বলে সোনার ফসল নিয়ে গেলেও, কৃষক প্রবহমান নদীর তীরে নিঃসঙ্গ ও অচল হয়ে বসে রইল।

৪৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'সোনাতর তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা সোনার তরীর রচনা স্থান শিলাইদহ, কাল—ফাল্গুন ১২৯৮, ইং ফেব্রুয়ারি ৪ মার্চ ১৮৯২। কবিতাটির নামকরণ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'সোনার তরী' সোনায় তৈরি তরী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি ব্যঞ্জনাগর্ভ। জীবনের সাধনায় যে স্বর্ণসম্ভার, তাই তো ফসল, সেই ফসল বহন করে যে তরী তা-ই সোনার তরী। কবিতার এই নামকরণটি আক্ষরিক-অর্থ-অতিরিক্ত অন্যতর অর্থে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। সংসার-তরণীতে কবি তাঁর সৃষ্টির সমস্ত সম্পদ তুলে দিলেও, সংসার কবিকে গ্রহণ করল না। মহাকালরূপী নেয়ে ইতিহাসরূপ সোনারতরী নিয়ে সোনার ধান রূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তুলে নিলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানুষের শিল্প, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সঞ্চিত থাকে। জগৎ স্রষ্টাকে চায় না, তার শিল্পকে সৃষ্টিকে চায়, এটাই চিরন্তন সত্য। মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যটি আলোচ্য কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে বলে কবি কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'সোনার তরী'। সোনার তরী মানব সংসারের তরী যাতে কবি বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে নিজের সৃষ্টি সম্ভারকে তুলে দিলেও "ঠাই নাই, ঠাই নাই—ছোট সে তরী"—তাই কবি স্বয়ং নির্জনতায় নির্বাসিতা। এ সব বিচারে কবিতার নামকরণ তাই সার্থক ও সুন্দর। এ পর্বে কবি আত্মস্থ, তাঁর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ—রবি-রশ্মির মধ্যাহ্নদীপ্তি বিচ্ছুরিত। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে কবির দৃষ্টি কল্পলোকের আলোকচ্ছটা থেকে বাস্তব জগতের উদার আকাশ-বাতাসে স্থাপিত। এ সময় কবির সৌন্দর্যানুভূতি ও বিশ্বানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশিত। কবি-কল্পনায় কবিত্বে প্রকাশ-ভঙ্গির চমৎকারিত্বে, ভাষার ঐশ্বর্যে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে কবিতাগুলির দীপ্যমান। 'সোনার তরী' তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে যুক্ত হয়েছে, একটি তত্ত্ব যার ব্যাখ্যা নানা কবিতায় রূপে ভিন্ন, স্বরূপে এক।

কবিতাটি রচনার সময় কবি জমিদারি দেখাশোনার কাজে কখনো শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসরে বাস করেছেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর অনুভবে, রঙে, রূপে কল্পনায়, নিত্য নতুন হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। পল্লীর নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। এই পরিচয় সূত্রেই 'সোনার তরী' কাব্য। 'সোনার তরী' কবিতা এই অনুভবের সৃষ্টি। এখানেও প্রকৃতি ও মানুষ, কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। একে বলা যেতে পারে বিশ্বানুভূতি—এটি সম্ভব কবির সৃষ্টিপ্রেরণা বা অন্তর্দেবতার অন্তঃপ্রেরণায়, সম্ভবত কবির এই অন্তর্দেবতাই সোনারতরী কবিতার 'নেয়ে'। অন্তর্দেবতা কোনো অলৌকিক শক্তিধর নন, কবির প্রকাশপ্রেরণা, যিনি কবির মনের মধ্যে বসে সমগ্র জগৎকে সাহিত্যে রূপদান করছেন। প্রকৃতি—সোনার তরী কবিতার উৎস, চলমান নদীস্রোত, যার মধ্যে কবি জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক উপলব্ধি করেছেন, তাকে এখানে দেখেছেন সাংকেতিকতায়, রহস্যময়, রূপকের ব্যবহারে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী রূপে।

'সোনার তরী' কাব্যে কবি নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ, পদ্মার প্রবহমানতা, বিচিত্র খণ্ড খণ্ড রূপকল্প ও চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে, কখনও সাঙ্কেতিক রহস্যময়তায়, কখনো বর্ষা প্রকৃতির বিষাদ উজ্জ্বলতায় প্রকাশিত হয়েছে। 'সোনার তরী' কবিতাটিও এরকমই এক ঘন বর্ষায় আবৃত নদীচরের নিসর্গচিত্র। কবির ভাষায় পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেটি এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

'সোনার তরী' কবিতা বহু-বিতর্কিত কবিতা। এর বস্তু সত্য ও ভাবসত্য নিয়ে নানা মত আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন— "…. ছিলাম পদ্মার বোটে। জলভারানত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরু শ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে ধেয়ে চলেছে….। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাটা ধানে বোঝাই চাষীদের নৌকা….. ভেসে চলেছে। এই …… ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত।" ……. ঐ বাদলদিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ও তার ছন্দে প্রকাশিত। কেউ কেউ এতে একটি রূপকের সন্ধান পেয়েছেন। রূপক ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন — "সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। ….. মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে, জীবনের ক্ষেত্রটা দ্বীপের মত … সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে। একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে……. আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে — তোমার জন্য জায়গা কোথায় ?" — মহাকাল মানুষের কর্মকীর্তি বহন করে রক্ষা করে, কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করে না। এ কবিতাকে কেউ কেউ বস্তুবিশ্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের রূপক হিসেবেও দেখেছেন। কবিতার মধ্যে যে সমস্ত প্রতীক বন্ধন করেছেন, তা হল ঃ সোনার তরী — বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য, মাঝি — সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নদী — অখণ্ড কালপ্রবাহ, খেত — জীবনের কর্মক্ষেত্র, ধান — সৌন্দর্যের সঞ্চার। ড. নীহার রঞ্জন রায় বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতা হিসেবেই 'সোনার তরী'কে দেখেছেন। শ্রাবণের ঘনবর্ষা, দুকূলভরা খরস্রোতা নদী প্রভৃতির অপার সৌন্দর্য স্পর্শকাতর কবিচিত্তে এক অপরূপ বেদনাপ্লুত রস ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব রাগিণী সৃষ্টি করে। সেই রাগিণীই সোনার তরী কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। এর কাছে তত্ত্ব অবান্তর। শূন্য নদীতীরে একা থাকার বেদনা, নিজেকে একান্ত করে দান করতে না পারায়, কোনো কোনো ভাব-মুহূর্তে প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণ বলে মনে হয়—এ তো কোন তত্ত্ব নয়, অনুভূত ভাব মাত্র। সুতরাং তত্ত্ব নিয়ে বিব্রত হওয়ার কারণ নেই।

কিছু কিছু সমালোচক কবিতাটির একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে 'সোনার তরী'কে শুধুমাত্র প্রকৃতির কবিতা বলা ঠিক হবে না, তাঁরা এতে একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা মানুষের জীবন এক খণ্ড চাষের জমি বিশেষ। এ জীবন মহাকাল বেষ্টিত, জীবনের ছোটো খেতটুকুও খরস্রেতা নদী ঘেরা। মানুষ তাঁর সারাজীবনের সম্পদ সংসার-তরণীতে বোঝাই করে দিলেও, সংসার তাকে গ্রহণ করলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না — ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই — ছোট সে তরী। মহাকালের কাছে ব্যক্তি নয়, তাঁর সৃষ্টিই প্রধান। সে সৃষ্টিকে রক্ষা করে। দেশ-কাল নিরপেক্ষ এই চিরন্তন দার্শনিক সত্যটি এই কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য— কিছু সমালোচকের এই বিশ্বাস।

সোনার তরী-র ছন্দ লক্ষণীয়। মিশ্রবৃত্তের পক্ষে অভূতপূর্ব (৮ + ৫) ১৩ মাত্রার ছত্র বিন্যাস স্তবক গঠনে ৮ + ৫, ৮ + ৫ , ৮ +৮ + ৮ + ৫ এবং ৮ + ৫ ভাবের উপযোগী একটি সুর যোগ করেছেন। প্রথম ৮ + ৫ মাত্রার দ্বিপার্বিক দুটি ছত্রের মাত্রা সমকত্ব ও অন্তমিল যে ধ্বনিসৌকর্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী তিনটি ৮ মাত্রার সমধ্বন্যাত্মক তিনটি পর্ব বিন্যস্ত করে একটি সুরের ঐকতান নিয়ে আসা হয়েছে। তার সঙ্গে ৮ + ৫ মাত্রার

শেষ ছত্রের মিলের সঙ্গে পূর্ববর্তী ৫ মাত্রার পর্বের অন্ত্যমিল কাব্য সুষমা নিয়ে এসেছে। এভাবে দুটি স্তবক কবিতাতে অভিনব ও বিরল ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে কোনো যুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির প্রয়োগ না থাকায় অসামান্য সুরতরঙ্গিত রমণীয়তা সৃষ্টি করেছে। চিত্র সন্নিবেশের কৌশলেও কবিতাটি আকর্ষক। ভরা নদী, খরজল, মেঘমেদুর পরপার, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তরী, মাঝি এ সবের সঙ্গে কবি হৃদয়ের ব্যাকুলতা একটা করুণ রাগিণী সৃষ্টি করেছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ *ভরা নদী ক্ষুরধারা* — বর্ষায় নদীজল ক্ষুরের মতো ধারালো অর্থাৎ খরস্রোতা বোঝানো হয়েছে।

তরু ছায়া মসীমাখা (কালিমাখা) — আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় গাছের ছায়ায় ঘেরা গ্রাম অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে।

বাঁকা জল করিছে খেলা — বাঁকা শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা যায়। একটি অর্থে নদী বেঁকে বেষ্টন করে আছে, অপর ব্যঞ্জনগর্ভ অর্থ 'কুটিল বা প্রতিকূল'।

কে আসে পারে — 'কে' এই শব্দটি ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে।

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে — বর্ষা সমাগমে কাটা ফসল নিয়ে তরীর অপেক্ষায় যখন আছেন এমনি সময় দূর থেকে দেখে কোন চেনা চেনা নেয়েকে যেন দেখা যাচ্ছে — এমনি সাধারণ অর্থ হলেও উদ্ধৃতিটি ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। যাকে দেখে 'মনে হয় চিনি উহারে' সে যে কবির হৃদয়গত অন্তর্যামী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনায় ব্যক্তি আমির অতিরিক্ত পৃথক এক অন্তঃপ্রেরণা বা অন্তর্শক্তি যাকে অনেকে অন্তর্দেবতা বা জীবনদেবতা বলেন তার কল্পনা করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় এরা আভাস, চিত্রা'য় তার পরিণতি। ইনিই কবির প্রেরণা, তাঁর কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। *কোন্ বিদেশে* — এখানে বলতে কোনো অজানা জগতে।

শুধু তুমি নিয়ে যাও— সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠ সম্ভার, মহাকালের তরণীতে তুলে দেওয়ার মধ্যেই স্রষ্টার সার্থকতা। কিন্তু কালের মাঝি কোনোদিকে দৃকপাত না করে নিতান্ত নিরাসক্ত চিত্তে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে স্রষ্টার একান্ত অনুরোধ সে জীবনের যা কিছু অর্জিত ফল তাকে যেন নিয়ে যায়।

এখন আমারে লহো করুণা করে — একলা জনবেষ্টিত ছোটো খেতে বসে আছি। করুণা করে তোমার তরীতে তুলে নাও। এর আধ্যাত্মিক অর্থ হ'তে পারে, আমাকে সকল কর্মবন্দি থেকে মুক্ত করো। অথবা আমার শিল্পের সঙ্গে আমারও অস্তিত্বকে যুক্ত করো।

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী — আজীবন সঞ্চিত সোনার ফসল, সংসার তরণীতে তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ কবির সৃষ্টি সমাদৃত হওয়ায় তিনি আনন্দিত। কিন্তু সেখানে তাঁর স্থান না হওয়ায় — শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি — তিনি একাকিত্বের বেদনায় বিষণ্ণ।

অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ — ১ একাধিকবার পড়ুন, তাহলেই প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) ছত্র পূরণ করুন

একখানি ছোট খেত, আমি একেলা —

.....

পরপারে দেখি আঁকা

.....

.....

প্রভাত বেলা

এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা ॥

খ) যেয়ো যেথা যেতে চাও

.....

.....

ক্ষমিক হেসে।

গ) চতুর্থ পর্বে কবি অনেকটা প্রাজ্ঞ দার্শনিক _____ _____ যিনি পুরাতনকে _____ দেখেছেন, পুরাতন _____ আবেগঋদ্ধ _____ পরিবর্তে অনেক শান্তি ও সংযত, _____।

ঘ) রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি হল—

পুনশ্চ _____ পত্রপুট _____

২) সঠিক উত্তরে ঠিক (✔) চিহ্ন দিন ঃ

ক) 'বলাকা' কাব্যের প্রকাশ — ১) ১৯১৪ খ্রিঃ

২) ১৯১৬ খ্রিঃ

৩) ১৯১৩ খ্রিঃ

খ) 'পত্রপুট' কাব্য প্রকাশ — ১) ১৯৩৪ খ্রিঃ

২) ১৯৩৫ খ্রিঃ

৩) ১৯৩৬ খ্রিঃ

গ) 'রোগশয্যায়' কাব্য প্রকাশ — ১) ১৯৪০ খ্রিঃ

২) ১৯৪১ খ্রিঃ

৩) ১৯৩৮ খ্রিঃ

ঘ) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্য — ১) জন্মদিন
২) শেষ লেখা
৩) শেষ সপ্তক

৩) 'সোনার তরী' কবিতা রচনা ও 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল লিখুন।

৪) কোন্ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'গদ্য কবিতা' রচনার সূচনা করেন ? কাব্যগ্রন্থটির রচনা কাল লিখুন।

৫) রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। আলোচনা ৫০টি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন।

৬) 'সোনার তরী' কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন (৩০টি শব্দ)।

৭) 'সোনার তরী' কাব্য রচনাকালের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার যতটুকু জানা আছে তা বর্ণনা করুন। (৫০টি শব্দে)।

৮) 'সোনার তরী' কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা বিস্তৃত করুন।

৯) 'সোনার তরী' কবিতায় কিছু সমালোচক দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৪৯.৭ মূলপাঠ — ২ ঃ শতাব্দীর সূর্য আজি

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বেজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

৪৯.৮ সারাংশ — ২

অস্ত্রে অস্ত্রে যখন রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে, তার মধ্য দিয়েই (ঊনবিংশ) শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্ত গেল। কুটিল ফণা তুলে নির্মম সভ্যতা নাগিনী তার বিষদাঁত নিয়ে উদ্যত। লোভী স্বার্থান্বেষীদের মুখোশ খসে গিয়ে বেধেছে সংঘাত। তারা জাতিপ্রেমের নামে, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে বর্বরতায় মেতে উঠেছে। শ্মশান কুকুরের মতো একদল কবি এর প্ররোচনা দিয়ে জয়গান গাইছে।

৪৯.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা , কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'শতাব্দীর সূর্য আজি' রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য (প্রকাশ ১৩০৮, ইং ১৯০১) কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতা। কাব্যের মতো কবিতার রচনাকাল ১৩০৭ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ইং ১৯০০-১৯০১। কবি এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কোনো নাম দেননি। কবিতার প্রথম ছত্র বা সংকলনের সংখ্যায় এর পরিচয়। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতাই কবির ঈশ্বর বা জীবননাথের জন্য নিবেদিত। "পারিবারিক শিক্ষা", ব্রাহ্ম-আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান, বিশেষত পিতা মহর্ষি দেবের সাহচর্যের ফলে কবির মনে কিছু ধর্মসংস্কার ও ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ভগবদ্‌ভক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্যের পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, পৃথিবী ও মানুষ তাঁর ছিল প্রথম আশ্রয় ; সংসারের অসংখ্য কাজের জন্য, দৈনন্দিন জীবনের নানা সংশয়-সংকট সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনা ও প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়েছে, ব্যাকুল করেছে, তারই প্রতিক্রিয়া কখনও কবিতায় প্রবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান কবিতা এমনই একটি ঘটনায় আশ্রয়ী যা মনুষ্যত্বের অবমাননার দ্বারা ধিক্কৃত। কবিকে এ সময়ে আমরা বিশেষভাবে বিশ্বমনস্ক দেখতে পাই। আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধ বা চীনের বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা তার স্বাক্ষর। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়—১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ৯০টি নৈবেদ্য লিখে ফেলেছেন। বর্তমান ৬৪ সংখ্যক কবিতা এই সময়ের মধ্যেই লেখা। নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিকে উৎসর্গ করেছেন। কাব্যের অধিকাংশ কবিতা প্রেম যৌবন সৌন্দর্য অথবা জীবন-প্রেতি জয়গান থাকলেও এর আড়ালে একটি তত্ত্ব, চিন্তা কল্পনা কাজ করেছে। একটি বিশেষ তত্ত্বও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটি ব্রাহ্মমতের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে রসের পরিবর্তে অনেক সময় ধর্ম ও নীতিবোধ প্রধানতর কাজ করেছে। উচ্চভাব ও স্পষ্ট বক্তব্য কবিতার প্রাণ। অপর কয়েকটি কবিতা সমাজ ইতিহাস, দেশপ্রেম, মনুষ্যধর্ম ও মানবিক আবেদনে তীব্র। তীক্ষ্ণ বক্তব্যে ক্ষুরধার অথচ মার্জিত, মহত্ত্বব্যঞ্জক ও ওজোগুণসম্পন্ন।

এ সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজরা বুয়রদের দেশ আক্রমণ (১২ অক্টোবর ১৮৯৯-৩১মে ১৯০২) করে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ও চীনে শোষণক্লিষ্ট চীনারা বিদেশী বিতাড়নের জন্য 'বক্সার বিদ্রোহে'র (১৯০০ খ্রিঃ) সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে ('স্বদেশ') এ প্রসঙ্গো লিখেছেন — "সম্প্রতি য়ুরোপে এক অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। .... সেই জন্যই বোয়ার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম প্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ৬৪ সংখ্যক কবিতা রচনা। কবি তখন শিলাইদহে। তিনি লক্ষ্য করেছেন নেশনতন্ত্রী ইউরোপ—অর্থ-বিত্ত-বৈভবের নেশায় মত্ত হয়ে হিংস্র আক্রমণে নেশন-এর ধুয়া তুলে মনুষ্যত্বের

অবমাননা করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য জাতিবৈরের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বার্থপর দেশপ্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কবি এইসব জাতিস্বার্থ প্রণোদিত যুদ্ধকে হিংসার উৎসব বলে গণ্য করেছেন, স্বার্থপরায়ণ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। নতুন শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের দেখা নেই, শতাব্দীর শেষ সূর্য ধ্বংসের মধ্য দিয়েই এভাবে অস্তমিত হল। এই বক্তব্যই পত্রপুটের ১৬ সংখ্যক কবিতায় (আফ্রিকা) ভিন্ন ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

* **পাদটীকা** — বুয়র ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু ওলন্দাজ ১৬৫২ খ্রিঃ প্রথম বসতি স্থাপন করে চাষবাস শুরু করে। এদেরই কিছু স্থানীয় অধিবাসী 'হটেনটট্' মেয়েদের বিয়ে করে স্থায়ী হয়। এই মিশ্র জাতি 'বুয়র' নামে পরিচিত। পরে ফরাসি, জার্মান, সুইডিসরা নানা ধরনের অত্যাচারে নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এখানে আসে। ইংরেজ আসে ১৯শ শতকের গোড়ায়। বুয়ররা উত্তরে সরে এসে তখনকার অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং ট্রানস্ভাল-এ নূতন বসতি করে। অরেঞ্জ নদীর ধারে হীরা, ট্রান্সভালে সোনা আবিষ্কার হলে, ভাগ্যান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপক আগমন শুরু হয়। স্বাতন্ত্র্যবাদী বুয়রদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, যার সূচনা ১৮৭৮-৭৯, পরিণতি ১৮৯৯-১৯০২ তে।

একই ধরনের শোষণের রাজনীতি চলেছিল চীনের ওপর। তাই বিদেশি বিতাড়নের জন্য 'বক্সার বিদ্রোহ' (১৯০০) শুরু হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু য়ুরোপীয় নিহত হলে, ইংরেজ-জার্মান-রুশের সম্মিলিত আক্রমণে চীনারা পর্যুদস্ত হয় (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১)। অতঃপর ১২টি পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি অসমচুক্তিতে চীনকে আবদ্ধ করে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

চতুর্দশপদী এই কবিতার উপস্থাপনা বক্তব্যের সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ। মিশ্রবৃত্তের সাধারণ পর্বের ৮ + ৬ ছত্রেতে বিন্যস্ত। প্রথম আট ছত্রে প্রস্তাবনা, শেষের ছয় ছত্রে মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা। এখানে যেহেতু বক্তব্য বিষয় বড়ো, তাই প্রস্তাবনা অংশ প্রবহমান মিশ্রবৃত্তের কক, খখ, গগ, ষষ্ঠকের পর ঘঘ, ঙঙ, চচ, ছছ ছত্রগুচ্ছে উপস্থিত করেছেন। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতায় আত্মনিবেদনের ভাব, অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকুতি, গভীর ধর্মবোধ প্রভৃতি মহর্ষির জীবনবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় অনেকটা শান্ত, সমাহিত ভাবপ্রকাশক নিরুত্তাপ, সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগে অভিব্যক্ত হয়েছে। আবার স্বদেশপ্রেমের কবিতায় ভাষা অপেক্ষা স্পষ্ট ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। বর্তমান কবিতায় ভাষা বক্তব্য বিষয়ের জন্য হয়ে উঠেছে তীব্র, তীক্ষ্ণ, দৃপ্ত। রক্তমেঘ, হিংসার উৎসব, গুপ্ত বিষদন্ত, প্রলয় মন্থন ক্ষোভ, শ্মশান কুক্কুর প্রভৃতি যুক্ত সংযুক্ত শব্দ যে ধ্বনি ও অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তা বক্তব্যকে তীব্রতর করেছে।

কবিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা —

শতাব্দীর সূর্য আজি ইত্যাদি— উনিশ শতকের শেষ সূর্য রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অস্ত গেল। একথা বলার পিছনে যে ব্যঞ্জনা আছে সেটিকে এভাবে বলা যায়—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আফ্রিকার সাধারণ বুয়র কৃষকদের আক্রমণ করছে হীন স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য। রবীন্দ্রনাথকে এ ঘটনা একান্ত বিদ্ধ করেছে বলেই নৈবেদ্যে ভগবৎভক্তিমূলক কাব্য রচনা করলেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি, তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট, ঋজু ওজস্বী ভাষায় বর্তমান কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী— য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে নির্দয় বিষধর সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ আফ্রিকার অরণ্য সমাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, সভ্যতার হিংস্র আক্রমণে আর্তরবে চিৎকার করছে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত — সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্বগ্রাসী আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা আফ্রিকার জুলু ও বুয়রদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণ। বুয়ররা নিজভূমে স্বাধিকার রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়তা দেখালে ছলে-বলে-কৌশলে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ইংরেজ শক্তিতে তাদের প্রতিহত করে। এর পিছনে যেমন ছিল জাতিগত স্বার্থ, তার পাশাপাশি ছিল তীব্র অর্থসম্পদ তৃষ্ণা। মানবতার পীড়নকারী অর্থলোভী সাম্রাজ্যবাদকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে।

প্রলয়মন্থন-ক্ষোভ — লোভ যখন হয় সীমাহীন, তখন লোভীর কোনো দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। স্বার্থপর মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এরই ফলে অনিবার্য ধ্বংস আসে। য়ুরোপী রাষ্ট্রশক্তির অপরিমেয় লোভ সেই বর্বতার পরিচয় দিচ্ছে।

কবিদল চীৎকারিছে—উনিশ শতকের শেষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক কবিকুল উৎকট, সংকীর্ণ, জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ করছিল, তাঁদের কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সেই সম্পর্কে এই তির্যক মন্তব্য। এসব কবিরা হলেন প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। যেমন — ইংরেজ কবি হার্ডি, রার্ডিয়ার্ডি কিপলিঙ, রুপার্ট ব্রুক, সিগফ্রিড স্যাসুন।

অনুশীলনী — ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্ত করুন। উত্তর শেষে ৪১ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলপাঠ — ২, প্রাসঙ্গিক আলোচনা সাহায্য নিয়ে উত্তর প্রস্তুত করুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে ..... নিমিষে
..... তার ভরি .....।

খ) ....., লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম .....
..... উঠিয়াছে জাগি
.....।

গ) রবীন্দ্রনাথ এক সময় _____ সম্পাদক ও _____ পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, _____ _____ ও _____ তাঁর ছিল প্রথম _____।

ঘ) আফ্রিকার _____, _____ বা চীনের _____ _____ প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা।

২) **সঠিক উত্তরে ঠিক (✔) চিহ্ন দিন ঃ**

ক) নৈবেদ্যে —
- ১) কবিতার নাম
- ২) কাব্যের নাম
- ১) কবিতাগুচ্ছের নাম

খ) নৈবেদ্যের কবিতা রচনা কাল —
- ১) ১৩০৭ সাল
- ২) ১৩০৮ সাল
- ১) ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ

৩) 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতাগুলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪) 'বুয়র' যুদ্ধ কী ও কেন সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৫০টি শব্দে)।

৫) 'শতাব্দীর সূর্য' বলতে কী বোঝান হয়েছে লিখুন।

৬) 'দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী' — সভ্যতাকে 'নাগিনী' এবং 'দয়াহীন' বলবার কারণ বুঝিয়ে লিখুন।

৭) 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত' — উদ্ধৃত অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৮) 'কবিদল চীৎকারিছে' — উদ্ধৃতিটির বক্তব্য বুঝিয়ে দিন এবং দুজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

৪৯.১০ মূলপাঠ — ৩ ঃ তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে (শঙ্খ)

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে,
এ কী রে দুর্দৈব।
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই রে অভয়শঙ্খ॥

চলেছিলাম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তিস্বর্গ।

এবার আমার হৃদয়ক্ষত,
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ॥

আরতিদীপ এই কি জ্বালা।
এই কি আমার সন্ধ্যা।

গাঁথব রক্তজবার মালা?
হ্যায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ॥

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপকতানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভরে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ॥

জানি জানি, তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারাসম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ॥

১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

৪৯.১১ সারাংশ — ৩

[শঙ্খ কবিতা রচনার সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হয়নি। কবির মনে এক দুঃসময়ের আশঙ্কা। এই প্রেক্ষাপটে কবিতা রচনা।]

যে শঙ্খে দেবতার আদেশ ধ্বনিত হচ্ছে, তাকে ধুলায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। বাতাস থেমে যাওয়া থেকে আসন্ন দুর্দৈবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ সময় যারা অভয় শঙ্খ নিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে কণ্ঠে (শান্তির) গান ও জয় পতাকা নিয়ে চলবে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে থাকতে দেখছি যখন, হৃদয়-

বেদনা দূর করে নিষ্কলঙ্ক হওয়ার আশায়, পূজার অর্ঘ্য নিয়ে শান্তির সন্ধানে চলেছে। সমস্ত কাজের শেষে শান্তিতে কাটাবার জন্য আরতির শান্ত প্রদীপে রজনীগন্ধার মালা দিয়ে, আজ আরাধনার সময় নয়, শঙ্খের যখন আহ্বান এই যে, রক্তজবাব মালাই গাঁথতে হবে।

অন্তরে যৌবনবেগ সঞ্চার করে উদ্দীপ্ত প্রাণের আনন্দে দীপক তান বেজে উঠুক। জাগুক অন্ধকারের পর, নতুন প্রাণের সাড়া। চোখে এখন আর ঘুম নয়। শ্রাবণের বর্ষণের মতো অস্ত্রাঘাত এলে, কেউ সমব্যথী হবে, কেউ বা হাহাকার করবে, এরই মধ্যে যে শঙ্খ বাজবে।

বিশ্রাম চেয়ে লজ্জা পেয়েছি। আজ সমস্ত আঘাত ও দুঃখ সয়েও রণসাজে সজ্জিত হয়ে, নির্ভয়ে সকল শক্তিতে অভয় শঙ্খ তুলে নিতে হবে।

৪৯.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'বলাকা'র কবিতাগুলি রচনার সূচনা ১৩২১ সালের ১৫ই বৈশাখ (১৯১৪) শান্তিনিকেতনে, শেষ কবিতা লেখা হয় কলকাতায় ৯ই বৈশাখ ১৩২৩ (১৯১৬) এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ (মে, ১৯১৬)। মূলপাঠের কবিতাটির (৪নং) রচনা, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ রামগড়ে এবং এটি আষাঢ়ের 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত হয়। কবি এ সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে হিমালয়ের রামগড়ে। তাঁর মনে দারুণ অশান্তি ও বেদনাভার। একমাত্র অ্যান্ড্রুজ এ খবর জানতেন। কবি বলেন,—"খবর পাইনি, প্রমাণ পাইনি, তবু মনে হচ্ছিল সারা জগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয় কাণ্ড আসছে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয় কাণ্ডের উদ্যোগ চলছে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন, চার নম্বর কবিতা একে একে এল। .....তখনও য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এদেশে আসেনি, — আমার চার নম্বর কবিতা (শঙ্খ) লেখবার পর যুদ্ধের খবর পেলাম।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা ২৮শে জুলাই ১৯১৪ (শ্রাবণ ১৩২১) শেষ ভার্সাই চুক্তিতে ২৮শে জুন, ১৯১৯।

যুদ্ধ কোনো সময়ই কারও কাঙ্ক্ষিত নয়। যুদ্ধ মানুষের সুখশান্তি শ্রী ও সম্পদের সর্বনাশ ঘটায়, অপরিসীম দুঃখ বেদনা ও ধ্বংসকে বয়ে আনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সীমাহীন লোভ ও দম্ভ জগতের অন্তরাত্মাকে পীড়িত করে আত্মপ্রকাশ করল। যুদ্ধে শঙ্খ বেজে উঠল। দারুণ প্রলয়ের সূচনা হল। বিশ্বের ১৮টি দেশ ক্রমান্বয়ে সর্বনাশা এই মহামরণযজ্ঞে জড়িয়ে পড়ল।

এ সময় শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণধর্মের তপস্যায়, সৌন্দর্যের রজনীগন্ধা নয়, মানবকল্যাণে, অনিবার্যকে ধ্বংসকে রোধ করতে রক্তজবার মালা নিয়ে যুদ্ধে ব্রতী হতে হবে। শান্ত সন্ধ্যায় পূজা-বন্দনা স্বাভাবিক কিন্তু বিধাতার আহ্বান যখন মহাশঙ্খধ্বনিতে এসে পৌঁছায় তখন আর উদাসীন থাকা সম্ভব হয় না, সাড়া দিতেই হয়। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের দিনে সচেতন মানুষ মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। তাই এ কবিতায় দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে কবি যুদ্ধের উপযোগী দীপক তানের সংগীতকে প্রার্থনা করেছেন। যৌবনের দুর্দমনীয় প্রাণশক্তিকে আহ্বান করেছেন। 'বলাকা'র কবিতায় কবি 'অজর-অমর-অক্ষয়' যৌবনের বন্দনা বার বার করেছেন। এখানেও তিনি প্রাণের হর্ষদীপ্তিকে কামনা করেছেন। দীপক রাগের ছোঁয়ায় যে আগুন জ্বলবে তাতে সমস্ত কলুষ, কল্মষ ক্ষয় হবে, অন্যায়ের অন্ধকার বিদূরিত হবে, দুহাতে শঙ্খ তুলে মানবাত্মার জয়ধ্বনি তখনই সম্ভব হবে।

কবিতার উপসংহারে দেখি বিরামে বিশ্রামে অলস জীবনযাপনের গ্লানিতে লজ্জিত কবি-আত্মা সে জড়তা কাটিয়ে ওঠবার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। বস্তুত এই কবিপ্রাণ বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী, সর্বমানুষের অন্তর্গত সত্তা। এভাবে কবি ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে পৌঁছেছেন। একক হৃদয়ের বেদনার ভার এভাবে বিশ্বমানবতার কল্যাণে 'অভয় শঙ্খ' হাতে তুলে নেওয়ার কথাতে সমাপ্ত হয়েছে। বলাকার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্য 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র কবিতাগুলিতে ভগবৎভক্তি ও ঈশ্বরানুভূতির আভাস খুবই স্পষ্ট। কিন্তু কবিচিত্ত এখানে দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকতে পারেনি। চিরচঞ্চল, চিরপথিক কবি হৃদয়, গতিহীন অধ্যাত্মরসবোধে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির মধ্যে স্থায়ী হন না। কবি ভক্ত সাধক নন, তাই বিপরীত শক্তির অভিঘাতে নিসর্গ ও বিপুল মানববিশ্বকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় এতদিনের সীমা থেকে অসীম দেখা নয়, এবার অসীমের দৃষ্টিতে সীমাকে দেখার যাত্রা শুরু হল। 'বলাকা'য় কবি প্রেম জীবন যৌবনের জয়গান করেছেন, ও চিরচঞ্চল গতিশীলতার কথা বলেছেন। এর পেছনে সমকালীন কয়েকটি ঘটনার অবদান থাকা অসম্ভব নয়। (১) 'সবুজপত্র' — সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ (১৯১৪) চলিত বাংলায় সংস্কারমুক্ত গতিশীল জীবন যৌবনের কথা বলার প্রতিশ্রুতি। (২) ইউরোপের উদ্দম সমাজ, তার অদ্ভুত কর্মচাঞ্চল্য তার সংঘাত সংঘর্ষ। (৩) ফরাসি দার্শনিক বের্গশঁ-র elan vital এর দার্শনিক তত্ত্ব কবি মানসে কিছু প্রভাব ফেলে থাকবে। বের্গসঁ-এর মতে জগতের সবকিছুই এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। গতিই হল কালপ্রবাহ। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। 'বলাকায়' এই চলার কথাই প্রধান। গতিতত্ত্বই বলাকার মূলসুর। বলাকা গতিরাগের কাব্য। এ গতি অসীমে ধাবমান। তাই উদ্দেশ্যহীন নয় আনন্দের রসলোকে পৌঁছানোই তার মূল লক্ষ্য। কবি যৌবনের মধ্যে সেই গতিকে দেখেছেন। কালধর্মে মানুষের শক্তি জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে সংস্কারের ঘেরাটোপে জড়িয়ে পড়ে। যৌবনের দুর্গম প্রাণশক্তি সেই রুদ্ধ স্রোতকে মুক্ত করতে পারে বলেই তিনি 'সবুজের অভিযান' আকাঙ্ক্ষা করেছেন। শঙ্খ (৪নং) কবিতায় তাই তিনি প্রার্থনা করেছেন—

যৌবনের পরশমণি / করাও তবে স্পর্শ
দীপক তানে উঠুক ধ্বনি / দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।

যৌবন গতিস্রোত আনে, সে নিয়ত গতিমান। বিশ্ব প্রকৃতিতে যে গতি, মানুষের ব্যক্তিজীবনেও সেই গতি। কবি 'বলাকায়' এই গতিকেই অনুভব করেছেন।

কবি 'বলাকা'য় জীবনের গতিকেই প্রকাশ করতে গিয়ে তার ছন্দপ্রকরণেও সেই গতিশীলতা নিয়ে এসেছেন। এই গতির প্রয়োজনে কবিতার ছন্দও বন্ধনমুক্ত হয়েছে। বলাকায় এই ছন্দকে 'মুক্তক' নামে অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এখানে সাবেক ছন্দকে ভেঙো নতুন করে ছন্দকে" পেয়েছেন। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল কবিতার ভাবের প্রয়োজনের কখনও অসম পর্ব ও ছত্র পর্বে মাত্রাবৈচিত্র্য এবং প্রবহমানতা। বাংলার তিন ধরনের (মিশ্রবৃত্ত, সরল কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত) ছন্দেরই মুক্তক রূপ রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে 'শঙ্খ' কবিতা মুক্তকের উদাহরণ নয়। এখানে সাধারণ দলবৃত্তের ছত্র পিছু চারটি পর্ব ভেঙে প্রতি ছত্রে দুটি করে সাজানো হয়েছে এবং এ কবিতায় স্পষ্ট প্রবহমানতা নেই, যেমন আছে 'নদী' বা 'শাহজাহান'-এ। এর ছন্দসজ্জাটি এইরকম —

তোমার শঙ্খ / ধুলায় পড়ে /	৪ + ৪ = দুটি পূর্ণ পর্ব
কেমন করে / সইব	৪ + ২ = একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব

বাতাস আলো / গেল মরে /	৪ + ৪
এ কীরে দু / দৈর্ব	৪ + ২
	(সূত্র ঃ ১ম স্তবক)

এবং

চলেছিলেম / পূজার ঘরে /	৪ + ৪
সাজিয়ে ফুলে / অর্ঘ্য।	৪ + ২
খুঁজি সারা / দিনের পরে	৪ + ৪
কোথায় শান্তি / স্বর্গ	৪ + ২
	(সূত্র ঃ ২য় স্তবক)

এখানে দলবৃত্তের তরঙ্গময় দোলাই কবির অন্তর্গত চাঞ্চল্যকে প্রকাশ করছে। যথার্থ মুক্তকের বৈশিষ্ট্য হল ছত্রদৈর্ঘ্যের অভাবিত অসমতা এবং সেই সঙ্গে প্রবহমানতা। পর্বও প্রায়ই অসমান হয়।

প্রসঙ্গত ৬নং কবিতা 'ছবি' বিশ্লেষণ করে দেখা যাক—

তুমি কি কেবল ছবি / শুধু পটে লিখা	৮ + ৬
ওই যে সুদূর / নীহারিকা	৬ + ৪
যারা / করে আছে ভিড়	২ + ৬
/ আকাশের নীড় ;	০ + ৬

এটি মিশ্রবৃত্ত পয়ার জাতীয় মুক্তক। এতে অন্ত্যমিল থাকলেও পর্বে ও পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাসমকত্ব নেই।

ড. নীহারঞ্জন রায় বলেছেন 'বলাকা'র ছন্দ যেন যৌবনের ছন্দ, দৃপ্তযোগে কলনৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন ভাদ্রের ভরা জোয়ারের বিরাট নদী।" এ ছন্দে আছে মুক্তির আশ্বাস। এর সূচনা মধূসূদনের অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান পয়ারে, পরিণতি রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ'র গদ্য কবিতা ছন্দে। এবাবে বাংলা কাব্যে অতুলনীয় সমৃদ্ধি এসেছে।

অনুশীলনী — ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪২ পাতার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ (৪৯.১২) এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা (৪৯.১৪) ভাল করে পড়ে উত্তর দিন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... এই কি জ্বালা।
এই কি আমার .....।
গাঁথব ..... মালা ?
হায় .....।

খ) তোমার কাছে ....

পেলেম শুধু ..... ।

এবার সকল ....

পরাও ..... ।

গ) শান্ত সন্ধ্যায় _____ _____ স্বাভাবিক কিন্তু _____ আহ্বান যখন _____ এসে পৌঁছায় তখন আর _____ থাকা সম্ভব হয় না, _____ দিতেই হয়।

ঘ) চিরচঞ্চল _____ কবি হৃদয় _____ _____ অধ্যাত্ম উপলব্ধির মধ্যে স্থায়ী হল না।

২) অর্থ লিখুন।

দুর্দৈব, ধ্বজা, অর্ঘ্য, যোঝাযুঝি, জয়ডঙ্ক।

৩) তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

গাঁথব রক্তজবার মালা ? দীপক তানে উঠুক ধ্বনি / দীপ্ত প্রাণের হর্ষ ; দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে / সুপ্তির পর্যঙ্ক।

৪) শঙ্খ কবিতার দুটি স্তবকের শেষে শঙ্খের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেগুলি উল্লেখ করুন।

৫) 'বলাকা' গতি রাগের কাব্য। — উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬) "বলাকা"য় কবি যে গতিবেগের কথা বলেছেন, তার পেছনে কয়েকটি ঘটনার অবদান থাকা সম্ভব।"—একটু বিশদ করুন।

৭) 'বলাকা'র 'মুক্তক' ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। ('শঙ্খ' ছাড়া অন্যান্য কবিতার অবলম্বনে আলোচ্য)

৪৯.১৩ মূলপাঠ — ৪, উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে (আফ্রিকা)

আফ্রিকা

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,

বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জল-স্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলেন ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।
হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধুলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।
সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;

শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।
আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকালে ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো, ক্ষমা করো,
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

শান্তিনিকেতন
২৮ শে মাঘ ১৩৪৩

৪৯.১৪ সারাংশ — ৪

সভ্যতার সেই আদিমযুগে বিশ্বের প্রাচ্য ভূভাগ থেকে আফ্রিকা নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, অন্ধকার গভীর অরণ্যানীতে সে সমাচ্ছন্ন হয়। সেখানকার দুর্গম তমসাময় প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু সমস্ত শঙ্কাকে হার মানাতে চাইছিল। ছায়াবৃতা আফ্রিকার মানবরূপ বাইরের পৃথিবীর উপেক্ষায় অবজ্ঞায় অজ্ঞাত থেকে গেছে। এমনই সময় (ইউরোপের) সভ্যতাভিমানী বর্বর নেকড়ের দল নির্লজ্জভাবে আফ্রিকাকে শৃঙ্খলিত করবার জন্য এগিয়ে এল। ফলে দস্যুদের আক্রমণে বীভৎস অত্যাচারে রক্তে-অশ্রুতে মিশে গেল আফ্রিকার মানবতা। ওদিকে (ইউরোপের) পাড়ায় পাড়ায় চলল উৎসব সমারোহ।

আজ সেই পশ্চিমাকাশে সেই পশু শক্তিই আবার নতুন করে যখন বেরিয়ে এসেছে, তখন মানহারা এই মানবীর (আফ্রিকার) পাশে দাঁড়িয়ে হিংস্র প্রলাপের মধ্যেও মানবতাবাদী কবি ক্ষমার আহ্বান জানাচ্ছেন। এটিই হোক সভ্যতার শেষ বাণী।

৪৯.১৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

পত্রপুট (১৯৩৬) কাব্য-এ ষোলো সংখ্যক কবিতা — 'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে' (নাম আফ্রিকা) কবি অমিয় চক্রবর্তী লিখে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করায় ২৮শে মাঘ ১৩৪৩, ইং ১২ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৩৬ রচনা করেন।

প্রথমে প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৩ ও পরে কবিতাটির পত্রপুটের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪৫) প্রকাশিত হয়। ৩রা অক্টোবর, ১৯৩৫ ফ্যাসিস্ত মুসোলিনির নির্দেশে ইতালীয় আক্রমণকারী সৈন্যদল অ্যাবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে তার প্রতিবাদ করে আফ্রিকা, 'ছায়াচ্ছন্ন' আফ্রিকার সকল বঞ্চনা লাঞ্ছনার রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে এক অনবদ্য কাব্য রূপ দিয়েছেন। বেদনায় ভারাক্রান্ত চিত্তে একান্ত মমতায় এক লাঞ্ছিতা কৃষ্ণা মানবীর রূপ এই কবিতায় তিনি নির্মাণ করেছেন। আবেদন রেখেছেন "দাঁড়াও ঐ মান-হারা মানবীর দ্বারে।"

কবির জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন আফ্রিকার ইতিহাস কবি ভালোকরেই জানতেন। মোরেল (E.D. Morel) প্রভৃতির বই তাঁর পড়া ছিল। পৃথিবীর অসহায় কৃষ্ণকায় মানুষদের প্রতি তথাকথিত সভ্য শ্বেতকায় মানুষের অত্যাচারে সুবিদিত। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অমিয় চক্রবর্তী কবিকে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আফ্রিকা'র ইংরেজি তর্জমা তিনি বিলাতে নির্বাসিত ইথিওপীয় সম্রাট হাইলে সেলেসীর হাতে দেন এবং সেটি পড়ে তিনি শান্তি পান। এছাড়াও উগান্ডার রাজকুমার নিয়াবঙ্গো কবিতাটির বান্টু ও সোয়াহিলি ভাষী আফ্রিকানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে বোঝা যায় 'পত্রপুট'-এর অন্যান্য কবিতা লেখা যখন চলছে পূজাবকাশে (অক্টোবর নভেম্বর ১৯৩৫ অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৪৩-এ), তখন কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ ও গান লেখায় ব্যস্ত। অকস্মাৎ অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধ হাইলে সেলাসি ও নিয়াবঙ্গার প্রতিক্রিয়া আফ্রিকার সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বের প্রতি তাঁকে মনোযোগী করে তোলে।

মুসোলিনির ইতালি যখন অ্যাবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) স্বাধীনতা গ্রাস করবার জন্য সামরিক অভিযান চালায়* তখন নানা দিক থেকে দেশটি ছিল অনগ্রসর, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। শ্বেতাঙ্গ বিদেশিরা আফ্রিকাকে নানা ভাগে ভাগ করে যখন বসতি স্থাপন করে তখন অ্যাবিসিনিয়া ছিল স্বাধীন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্রাট হাইলে সেলাসির পক্ষে সোভিয়েতের সমর্থনে বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। শ্বেতাঙ্গারা সেখানকার মানুষদের উপর বর্বর অত্যাচার ও নিষ্ঠুর অপমান করেছে, এ সংবাদ তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আফ্রিকার সেই অত্যাচার ও পৃথিবীব্যাপী শোষণের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। নৈবেদ্যে-র 'শতাব্দীর সূর্য আজি'র মতো এবারও তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা জেগে উঠেছে। শক্তিমদমত্ত তথাকথিত সভ্য, অত্যাচারী উপনিবেশবাসীদের প্রতি তাঁর পুঞ্জীভূত ঘৃণা এখানে তীব্রভাবে প্রকাশিত হল। কবি বলেছেন, "সভ্যের বর্বর লোভ/নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।" ষোলো সংখ্যক 'আফ্রিকা' কবিতার পরবর্তী রচনা 'সতের' সংখ্যক কবিতায় জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ ও চীনের সাংহাই এবং নানকিং অধিকার কালে জাপানি বোমার আঘাতে অগণিত শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলা হত্যার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ১৩৪৪ সালের ৭ই পৌষ উৎসবের ভাষণে চীনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে বলেছেন, "চীনের প্রতি (জাপানের) নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, ... দুঃখ বোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে ..... আমাদের অস্ত্র নেই ..... মেশিনগান নেই, চিন্তা আছে.....তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব।"

* Italy became particularly active at the beginning of 1930s. To consolidate its colonial possessions in Africa, Indian imperialism had long had aggressive designs with regard to Ethiopia, which was richly endowed with raw materials and occupied an advantageous strategic position. From the autumn of 1934 Italy started organising

provocations against Ethiopia. In this period, under the guise of "non-interference." French and Britain consented to the seizure of Ethiopia by Italy. Taking advantage of the connivance of the French and British imperialists, the Italian fascists began military operations against Ethiopia on October 3, 1935. The Ethiopian people rose to defend their country and waged a just defensive war, but they were greatly outnumbered. The Ethiopians did not have modern arms and frequently operated separately, whereas the Italian's used modern tanks, aircraft, and latest artillery against Ethiopian troops, and to crown it all, began to use chemical agents. (A. Contemporary World History 1917-45 V. Alexandrov, 446-47)

এভাবে কবি "বিশ্বমানবের দুঃখ আপনারই দুঃখ" রূপে গ্রহণ করেছেন। কোথাও ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন, কোথায় চীন — এ সবের জন্য কবির বেদনাবোধ আমাদের বিচলিত করে। কিন্তু এরও মধ্যে কবি মানব ইতিহাসের মূলে যে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে সে কথা মনে রেখে কল্যাণের পক্ষে সমস্ত কর্মকে, চেষ্টাকে প্রয়োগ করতে বলেছেন। সর্বজীবে মঙ্গালচিন্তা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। তাই আহ্বান জানিয়েছে, "এসো যুগান্তরের কবি / আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে / দাঁড়াও মানহারা মানবীর দ্বারে / বলো, ক্ষমা করো — / হিংস্র প্রলাপের মধ্যে / সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।" / — এই মঙ্গাল চিন্তাই কবির মতে ভারতবর্ষকে সর্বজাতির শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে।

তথাপি বার বার দেখা গেছে, পৃথিবীর যেখানেই স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে বা মানবতার অপমান ঘটেছে, সমস্ত ঘটনাই কবি-আত্মাকে সমভাবে মর্মাহত করেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯২৯-১৯৩৩ বিশ্বব্যাপী মন্দা শিল্পে বাণিজ্যে য়ুরোপে যখন হতাশা, সেই সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশগুলির প্রতি প্রথমে থাবা বসায়। কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষুদ্র স্বার্থ এতে চরিতার্থ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনা। এ পর্যায়ের কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথকে স্থিতধী চিত্তে ঘটনাগুলির মূল্যায়ন করতে দেখা গেছে। সেখানে যেমন একদিকে ছিল প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য, অন্যদিকে তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া।

'পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র রচনাভঙ্গির ছন্দ-অলংকার ভাষারীতি ও চিত্রাঙ্কন বিশিষ্টতার দাবি রাখে। প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এ পর্বে প্রায় নেই। তার পরিবর্তে শান্ত, সংযত গদ্যবন্ধ বাগ্‌ভঙ্গিতে গভীর কথা সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। উপমা প্রয়োগ, ছন্দরচনায় গদ্যভঙ্গির অনায়াস ব্যবহার এবং অনলংকৃত বাগ্‌বিন্যাস এ পর্যায়ের কাব্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গদ্য-ছন্দ বলতে গদ্য কবিতার ছন্দ বুঝিয়েছেন। গদ্যে যেহেতু অর্থবহ শব্দ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্যবহার করা হয় এবং পদ্যে থাকে ধ্বনি প্রবাহ, তাই গদ্য-কবিতায় পর্ব অর্থানুসারী, কিন্তু কবিতার মিল ধ্বনি অনুসারী, গদ্য-কবিতা ভাবানুসারী হওয়ায় তার পর্ব ভাবপর্ব—তার ছন্দ ভাব-ছন্দ, তাই তার পর্বও মাত্রাসংখ্যা ধ্বনি নির্ভর কবিতার মতো সুনিয়মিত, সুশৃঙ্খল নয়। এ ছন্দ কবির বাগ্‌বিন্যাসের ছন্দবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কবিতার ভাষা তৎসম শব্দ বর্জিত না হলেও এতে চলিত গদ্যের ব্যবহার বেশি, এর ছন্দেও তাই মৌখিক ভাষার গুরুত্ব। 'আফ্রিকা'র কয়েকটি ছত্র বিশ্লেষণ করলেই সেটি ধরা পড়বে।

উদ্‌ভ্রান্ত সেই / আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন / নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে / বারবার করছিলেন / বিধ্বস্ত
তার সেই অধৈর্যে / ঘন ঘন / মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর / বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, / আফ্রিকা ;

অথবা

হায় ছায়াবৃতা /
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল / তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

দুটি স্তবকের ছত্রগুচ্ছের পর্বসংখ্যা এক থেকে তিনের মধ্যে। কোথাও ছত্রের পর্ববহুত্ব নেই। প্রথম স্তবকে কয়েকটি ধ্বনিসঞ্চারী শব্দ ব্যবহার হলেও সাধারণভাবে কথা ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতাটি মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের আঙ্গিকে গদ্য-ছন্দে রচিত কবিতা বা গদ্যিকা। আফ্রিকায় ধ্বনি সুষমার পরিচয় তার অনুপ্রাসে 'রুদ্র সমুদ্র', 'প্রাচী ধরিত্রী', 'সভ্যের বর্বর লোভ' এবং উপমা 'তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদ' বা দেশের উপর নির্যাতিত মানুষের ব্যবহার আরোপ প্রভৃতি কবিতার রমণীয়তাকে বাড়িয়েছে। যথা— 'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে / এল মানুষ ধরার দল / গর্বে তারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে'/—এখানে বৈপরীত্যে যাদের চিত্র বর্ণনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাদের প্রতি কবির ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হওয়ায় উপমেয়কে উমানের চেয়ে নিকৃষ্ট করে দেখানোর ব্যতিরেকে অলঙ্কার হয়েছে। চিত্রকল্প "প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস"—প্রভৃতি স্মরণীয় চিত্র ও ছত্র কবিতাটিতে নতুন মাতা যোগ করেছে।

॥ প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ॥

"উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে..... অসন্তোষে — সূর্যের অগ্নিবলয়",

সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি নানা জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশ স্থলভূমি ও প্রাণের প্রকাশ ঘটে। কোটি কোটি বৎসরের সেই সুপ্রাচীন ইতিহাস বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। পরে প্রাগৈতিহাসিক কালে ভূত্বকের নানা বিপর্যয়ে বিশ্ব প্রকৃতিতে নানা ঘটনা ঘটেছে, তারই ইঙ্গিত এখানে আছে।

"রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর.... আফ্রিকা" প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইউরোপের সঙ্গে জিব্রাল্টার টিউনিস সিসিলি ও ইতালি যুক্ত ছিল। তখন ভূমধ্যসাগর দুটি হ্রদের মতো মনে হত। ভূত্বকের নানা বিপর্যয়ে কালক্রমে ইউরোপ থেকে আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হয়। পূর্ব গোলার্ধের এই মহাদেশ এক সময় এশিয়ার ও ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অপর দিকে আফ্রিকা পূর্বে সাইনাই উপদ্বীপ দিয়ে এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুয়েজ খাল কাটার পর এশিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিচ্ছিন্ন অংশ বর্তমানে মিশরের অন্তর্গত।

"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে" য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের উপনিবেশ গড়ে আফ্রিকাকে পদানত ও শৃঙ্খলিত করেছে, এই পরাধীনতার নিগড়কে এখানে বোঝানো হয়েছে 'লোহার হাতকড়ি' ব্যঞ্জনায়।

"সভ্যের বর্বর লোভ" আফ্রিকার মতো বিচ্ছিন্ন একটি মহাদেশ গভীর অরণ্যসঙ্কুল। সংখ্যাতীত জাতি ও উপজাতিকে বিভক্ত সে দেশে দেশে আধুনিক সভ্যতার আলো তখনও প্রবেশ করেনি। উপজাতি গোষ্ঠীশাসিত সেই আদিম সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশ না ঘটলেও দেশটি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সভ্যতাভিমানী য়ুরোপের দেশগুলি তাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রিক স্বার্থ ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে, সীমাহীন লোভের তাড়নায় এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং দেশের জনগোষ্ঠীর শ্রমকে ব্যবহার করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করতে অমানবিক হিংস্রতার আশ্রয় নেয়।

"মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা.... দেবতার নামে" আফ্রিকার জনগণ যখন হিংস্র নগ্ন আক্রমণে রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত, সেই সময় সমুদ্রের অপর পারে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সম্পদের প্রাচুর্যে, আনন্দ-উৎসবে দেবতার কাছে কল্যাণ ভিক্ষা চলছে। এই বিপরীত চিত্রটি তুলে ধরে কবি আফ্রিকার শোষিত অসহায় মানুষের প্রতি সমবেদনায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি তির্যক বাণ নিক্ষেপ করেছেন।

'আফ্রিকা' কবিতাটি বিশেষ দেশকালের কথা হলেও, আজও যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্র নখর দেশ দেশান্তরে মানুষকে বিপন্ন করছে দেখতে পাওয়া যায়, তখন স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় এ কবিতার গুরুত্ব। এভাবে কবিতাটি দেশকাল নিরপেক্ষ একটি অসাধারণ কাব্যশিল্প বলে মানা।

অনুশীলনী — ৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪২ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য ৪৯.১৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা একাধিক বার পড়ুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) যেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
চিনেছিলে .... দুর্বোধ সংকেত
প্রকৃতির ..... জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল .... মনে।

খ) মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা,
.... দয়াময় .... ;
শিশুরা .... কোলে ;
কবির সংগীত বেজে উঠছিল
....।

২) সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক) প্রাচীন ধরিত্রী, চেতনাতীত মন, উপেক্ষার আবিল দৃষ্টি, মানুষ ধরার দল, সভ্যের বর্বর লোভ, হিংস্র প্রলোপ।

৩) 'আফ্রিকা' কবিতাটির বিষয়বস্তু আপনার নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৪) 'বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়' ছত্রটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫) দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে' — ছত্রটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬) 'আফ্রিকা' কবিতাটির ছন্দ-বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪৯.১৬ মূলপাঠ — ৫, অমৃত

অমৃত

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেন তাকে,
'ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন —
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত।
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বলো।'
অমিয়া হাসল একটু বিরস হাসি ;
বললে, 'এ কি উপদেশ।'
আমি বললেন তার হাত চেপে ধরে,
'ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ,
বুঝবে একদিন।'

বিরক্ত হল অমিয়া ;
বললে 'তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন তোমার।'
আমি বললেম, 'বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।'

অমিয়া মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়িল,
চলল ঘরের বাইরে।
আমি বললেন, 'শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।'

দিন যায়, রাত যায়,
মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থামতে পারি নে, থামাতে পারি নে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে, বিশ্রাম চাই নিতান্তই—
দেহের কল অচল হয়ে এল বলে।

গেলেম দূরদেশে নির্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলির অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখিদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে-চলা
তার ফটিক-জলের কল্‌কলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জনতার।
নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুন্‌গুনিয়ে বনের থেকে বনে।

দল বেঁধেছে নারকেল গাছ—
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে জেদালো ঢেউ
মোটা মোটা কালো পাথরে ;
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।
ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্মের নেশার ঝাঁজ এল মরে।
এতকালের খাটুনি মনে হল যেন ফাঁকি,
প্রাণ উঠল দু হাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা নীলিমায়।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউ গাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া ;
ঝর্‌ঝর্‌ করে উঠছে তার পাতা।
বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা—
টেলিগ্রাফের তারে বলে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে।
শরৎ-আকাশের নির্মল নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্‌ অনাদি নির্বাসনের গভীর বিষাদ।

মনের মধ্যে হুহু করে উঠছে—
'ফিরে যেতে হবে।'
থেকে থেকে মনে পড়ছে
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
ঝলে উঠেছিল যে আলো।

সেদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চলে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে ;
মনে হল, সেখানে বাস নেই কারও।
এলেম সদর দরজার সামনে ;
দেখি, তালা বন্ধ।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে।
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।
অনেক সন্ধানের পর
দেখা হল শেষে।
কোন্ বারো-ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিনকাল-পেরোনো গ্রাম
একটি পুরোনো দিঘির ধারে ;
দিঘির নামেই লোচনদিঘি তার নাম।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপসা অক্ষরপটওয়ালা
ভাঙা দেবালয়।
পূর্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখেনি ;
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজরভাঙা
আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে —
ছাইরঙের মোটা শাড়ি পরা,
দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো,
ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে।

পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে
জল দিচ্ছে সবজিখেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারও মুখে এল না
প্রথম-দেখার কোনো সম্ভাষণ
কোনো প্রশ্ন।

চোখের আড়ে
আমার দামি জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে—
'বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা ;
এসো-না, নিড়িয়ে দেবে
বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।

জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উলটিয়ে।
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ ছিল পকেটে,
বুঝলেম, দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।
একটু কেশে শুধালেম,
'এখানে থাক কোথায়'
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, 'দেখবে ?'
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে,
দালানের পুব দিকটাতে
শতরঞ্জের পর্দা দিয়ে ভাগ-করা ঘরে
একটা তক্তপোষের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,
ছিটের-খাপে-ঢাকা সেতার
দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া ;
দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তরকোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুনি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।

দক্ষিণকোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী,
আর রঙকরা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।
অমিয়া বললেন, 'এই আমার বাসা,
একটু বোসো, আসছি আমি।'

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে ডাকছে কোকিল।
মানকচুর ঝোপের পাশে
বিষম খেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিখ।
দেখা যায়, ঝিল্‌মিল্‌ করছে ঢালু পাড়ির তলায়
দিধির উত্তরধারের একটুকরো জল,
কলমি শাকের পাড়-দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি—
অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে—
কয়লার আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো —
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,

চোখে যেন দূরে ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আঁটা।

এমনি সময় অমিয়া নিয়ে এল
থালায় করে জলখাবার—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল-নাড়ু,
কালো পাথরবাটিতে দুধ,
এক-গেলাস ডাবের জল।

মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে-বোনা একটা আসন দিল পেতে।
'খিদে নেই' বললে মিথ্যে হত না,
'রুচি নেই' বললে সত্য হত,
কিন্তু, খেতেই হল।
তার পরে শোনা গেল খবর।

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁশ ছিল না আর-কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই-একটি ছেলে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারে বারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপড়ে হাল ছেড়েছেন যখন তিনি
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক—
মাধপাড়ার রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ।
রায়বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।

তাঁর ছেলেকে কোনো কন্যার পিতা পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, 'বিষয়কর্ম দেখো'
ছেলে বললেন, 'কী হবে।'
লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।
অমিয়ার বাবা বললেন, ভয় নেই,
নরম হয়ে এল বলে দেশের ভিজে হাওয়ায়।
দুদিনে অমিয়া হল তার চেলা।
যখন-তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললেন, 'কী হবে।'
বাবা রেগে বললেন, 'তবে তুমি আস কেন রোজ।'
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
'অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।'
অমিয়ার শেষ কথা এই —
'এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।'
আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললেন, 'জেলখানায়'।

শান্তিনিকেতন
৩ জুলাই ১৯৩৬

৪৯.১৭ সারাংশ — ৫

আলোচ্য কবিতার লক্ষ্য যে নারী সেই 'অমিয়া'কে সম্বোধন করে নায়ক বলেছে, ভারতীয় নারীত্বের মূর্ত প্রতীক (মৈত্রেয়ী) একদিন বলেছিলেন উপকরণ নয়, তিনি 'অমৃত' চান—যা প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। অমিয়া চেয়েছে নায়ক তাকে মিথ্যে থেকে জোর করে ভালোবাসার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিক। কুণ্ঠিত নায়ক বলেছে, ধনে সমান না হয়ে সেখানে নিয়ে যেতে বাধে। তাই অমিয়ার ভালোবাসার বদলে দারিদ্র্যের অসম্মান সে দেবে না এই সঙ্কল্প নিয়ে 'সোনার মদের নেশায়' মত্ত হয়। কিন্তু, খ্যাতি আর আত্মশ্লাঘার সঞ্চয়ের নেশা বাড়তেই থাকে। শেষে ডাক্তার বলে, নায়কের দেহের কল অচল হয়ে এল বলে, তাই বিশ্রাম অবশ্যই চাই। দূর নির্জনে সমুদ্র, নদী, পাহাড় তার অফুরন্ত রূপ-রস-সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেওয়ায় সম্পদের নেশার ঝাঁজ কমে যায়। মনে পড়ে কোনো অনাদি নির্বাসনের গভীর বিশদ। 'ফিরে যেতে হবে' এই কথা মনের মধ্যে হু হু করে উঠে। দেশে ফিরে তার (অমিয়ার) কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে যখন পাওয়া গেল, তখন যে এক অন্য মানুষ। অমৃতের সন্ধান সে পেয়েছে। আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে আসা রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে 'যার বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে/রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা—সেই মহীভূষণ অমিয়াকে নিয়ে এসেছে 'যেখানে ওর কাজ।'

এ কাব্যের নায়ক অমিয়াকে 'অমৃতের' কথা বলে নিজে অকিঞ্চন থেকে 'বিত্ত-খ্যাত-আত্মশ্লাঘা'য় ভালবাসার মূল্য দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। অমিয়া 'লক্ষ্মী খেদানো' 'বাদুড়ের ঠোকার' স্পর্শে তখন অমৃতের সন্ধান পেয়েছে।

৪৯.১৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

শ্যামলীর 'অমৃত' কবিতাটি রচনা, শান্তিনিকেতন, ৩রা জুলাই, ১৯৩৬। বরাহনগরে প্রশান্ত মহলানবীশদের আবাসে অবস্থানকালে এই কাব্যগ্রন্থের সূচনা 'দ্বৈত' ও 'শেষ প্রহরে' (২৩শে মে, ১৯৩৬) শেষ—'শ্যামলী' (৬ই আগস্ট, ১৯৩৫)। আর রানী মহলানবীশকে উৎসর্গ ১লা ভাদ্র, ১৩৪৩, ইং ১৭ই আগস্ট, ১৯৩৬)। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৪৩ এবং ইং ১৯৩৬-এ। এই বছরই বৈশাখ / এপ্রিলে 'পত্রপুট' প্রকাশ।

১৯৩৫-এর রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় শান্তিনিকেতনে 'শ্যামলী' নামে সুদৃশ্য এক মাটির বাড়ি তৈরি এবং তাতে গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হয়। কবি এখানে কিছুদিন থাকেন। ইট পাথরে গাথা বাড়ি মাঝে মাঝেই কবিমনে 'বন্ধনে'র প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। এ থেকে সাময়িক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথকে এ সময় পেয়ে বসেছিল। তাঁর মনে হয়েছে, মাটির ঘরে বন্ধন কম, তা তৈরিও যেমন সহজ আবার সে ভেঙেও যায় সহজে। তিনি মনে করেছেন মাটির ঘরে থাকার মধ্যে একটি উদাসীন নিরাসক্তি বিরাজ করে। এ কাব্যের শেষ কবিতা 'শ্যামলী' এই মাটির ঘরকে নিয়ে লেখা। আর 'অমৃত' কবিতার 'অমিয়া' বাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ প্রান্তরে গড়ে ওঠা একটি প্রেমিকা নারী যার হৃদয়ে লেগেছে প্রকৃতির শ্যামল রঙ, যে উপকরণের দুর্গ থেকে বেড়িয়ে এসে অমৃতের সাধনা করেছে। রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়ের ঠোকা-খাওয়া মহীভূষণ অমিয়াকে সেই অমৃতের মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু কবিতার কথক-নায়ক তা পারেননি।

নারী যুগযুগান্ত ধরেই কবি শিল্পীদের প্রেরণাস্থল। তাদের রূপসৃষ্টিতে কল্পনায় ধ্যানে নানাভাবে সে মূর্ত বা বিমূর্তভাবে প্রকাশ পায়। কবি জীবনে ও সাহিত্যে নারী তাই অনেকখানি জুড়ে আছে। শ্যামলীর কয়েকটি

কবিতার রূপে-রসে বৈচিত্র্যে এই নারীস্বরূপ নানা বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। 'মিলভাঙা', 'কনি' বা 'অমৃত' প্রেমের কবিতা হলেও স্বরূপে স্বতন্ত্র। এ কবিতাগুলি আখ্যানমূলক, অনেকটা কথিকাধর্মী। কবিতাগুলিতে লিরিক মাধুর্য পূর্বাপর আশ্লিষ্ট হয়ে আছে। কথা অংশ যেন মানবজীবনের কতকগুলি ছোটো ছোটো ছবি। সেখানে প্রেম নিয়ে এসেছে নারীহৃদয়ে সবৈশ্বর্যের মধ্যে ত্যাগের মন্ত্র। তাই ধনী কন্যা অমিয়া মহীভূষণের প্রেরণায় অনায়াসে উপকরণের দুর্গ থেকে উদ্ধার পায়। নীরস বৈরাগ্যসাধনা নয়, সমাজের জন্য ত্যাগব্রতে সে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। পক্ষান্তরে কবিতার কথক নায়ক ভালোবাসার অমৃত খুঁজতে গিয়ে বাঁধা পড়েছে বিত্ত, খ্যাতি ও আত্মশ্লাঘা অর্জনের মোহে। এখানেই তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি। অমিয়া যেমন পূর্ণতাকে পেল, নায়ক তেমনই সমস্ত (সম্পদ) পেয়েও অমৃতকে হারাল। অমিয়া বস্তুবিশ্বকে স্বীকার করেও, দুঃখসাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে ত্যাগ কর্মের মধ্যে প্রেমকে নূতনভাবে আবিষ্কার করেছিল। এ পর্বে রবীন্দ্র কবিমানসের দিক থেকে এই উপস্থাপনা সবিশেষ উপযোগী। বস্তুসর্বস্ব রূপাশ্রিত প্রেমমোহের আতিশয্য নয়, তাকে পেরিয়ে কল্যাণব্রতের দিকে চলার মধ্যেই 'চিরসুন্দরের সুরপুর' বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ 'অমৃতে' প্রেমের এই মূলীভূত সৌন্দর্যকে, মনুষ্যত্বসাধনার অন্তর্গত কল্যাণকে স্বীকার করে মেনে নিয়েছেন—মানুষের জীবনে। মৈত্রেয়ী-প্রার্থিত অমৃতের জন্য 'অমৃত'-এর অমিয়ার অমর্ত্যলোকের সন্ধান প্রয়োজন হয়নি, 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডলির' মধ্যেই যে তাঁর ভালোবাসার অমৃতকে খুঁজে পেয়েছিল। প্রেমের এই কবিতাটিতে নায়কের অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা 'মিল-ভাঙা' কবিতা স্মরণে রেখে বলা যায় বোধ করি বার্ধক্যে উপনীত কবি পূর্ব জীবনের কিছু হারিয়ে যাওয়া সুরকে 'শ্যামলী'র কয়েকটি কবিতায় ফিরে ফিরে অনুভব করেছেন, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিরহের বৈরাগ্যের সুর।

'পুনশ্চ' পর্বের গদ্যছন্দে লেখা কবিতার শেষ কাব 'শ্যামলী'। শ্যামলী 'অমৃত' কবিতায় ভাবসুন্দর কথ্য ভাষার ? কলকাতা অঞ্চলের কথা ক্রিয়াপদ—'লুম' 'লেম'-এর প্রয়োগ ও বাক্য গঠন রীতি অনুসরণ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণে অস্পষ্ট ছন্দতরঙ্গ বা ছন্দস্পন্দন অনুভব করা যায়। ভাবাবেগের স্পর্শেই কবিতায় গদ্যছন্দের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। কবিতাটি গদ্য ছন্দে লেখা। এখানে আধুনিক কথ্য ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহার করায় জীবনের বাস্তবের সঙ্গে তার আবেগময় এক উন্নতধ্বনিও মিলিত হয়েছে। ছত্রের পর্বসংখ্যা এক থেকে তিন। দ্বিতীয় স্তবকের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে ছত্রের কথ্যতানির্ভর এই পর্ব বিন্যাস দেখানো হল।

বিরক্ত হন অমিয়া !
বললে / তুমি কেন / নিয়ে গেলেনা আমাকে / মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন / তোমার।
আমি বললেম, / 'বাধে আত্মগৌরবে।
যতদিন না / ধনে হব সমান
আসব না / তোমার কাছে।'

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নয়া কয়েকটি সরল চিত্রকল্প কবিতার মধ্যে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের অসামান্য তাৎপর্য নিয়ে এসেছে অমৃতে।

যেমন,

ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখিদের পাড়ায়।

ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়েছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।

অথবা—

বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা—
টেলিগ্রাফের তারে বলে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে !

শ্যামলী পর্বের কবিতাগুলির বক্তব্য প্রধান। প্রকাশভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সহজ, গদ্যছন্দ স্বাভাবিকভাবেই বক্তব্যকে অনুসরণ করেছে। শেষ পর্বে কবির জনমানসের কাছ পৌঁছোবার আগ্রহ থাকলেও 'মাঝে মাঝে ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' গেলেও 'ভিতরে প্রবেশ' করতে পারেননি—অন্তরায় তাঁর শীলিত কাব্য ভাষা। যা মুখ্যত বিদগ্ধজনের ভাষা। এ কবিতায় ভাষা 'মাটির কাছাকাছি' ভাষা নয়। এ ভাষা পরিশীলিত কাব্যপাঠকের জন্য।

'ভারতের একজন নারী.....তিনি চান অমৃত'— কবি 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ-এর অন্তর্গত যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর একটি বাণী — 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' (২/৪/৩) দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত তৃতীয় শ্লোক) — 'যা আমাকে অমৃতত্ব দেবে না, তা নিয়ে আমি কী করব।' মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাকে শুধু ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের আকুতি বলা যায় না, যে কোনো বাহ্য উপকরণকে সরিয়ে সাধনার দ্বারা অন্তরাত্মার অমরত্বকে অমৃত মনে করেছেন।

'ভালোবাসাই সেই অমৃত ..... বুঝবে একদিন' — শ্যামলীর 'অমৃত' কবিতার নায়িকা ধনীর কন্যা অমিয়াকে লক্ষ্য করে নায়ক বলেছ যে, মৈত্রেয়ী প্রার্থিত সেই অমৃতের জন্য অমর্ত্যলোকের সন্ধান প্রয়োজন নেই, মর্তের ভালোবাসার মধ্যেই তাকে পাওয়া যায়। এভাবে কবি উপনিষদের বাণীকে যথার্থতায় অনুসরণ না করে স্বতন্ত্র প্রেক্ষায় নিজের মতো করে তার অর্থকে সম্প্রসারিত করেছেন।

'দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান' — অমৃত কবিতার নায়ক মৈত্রেয়ীর বাণীর সূত্র ধরে নায়িকা অমিয়াকে প্রকৃত ভালোবাসার মধ্য দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অমৃতকে পাওয়া যায় এ কথা স্মরণ করিয়েও, নিজে ধনীকন্যা অমিয়ার যোগ্য হয়ে উঠবার জন্য সম্পদের সন্ধানে বেড়িয়েছে নিজের পৌরুষের পরিচয় দিতে। নায়কের এই অভিমান তার চরিত্রের একটি ইতিবাচক দিক। কিন্তু কোনোকিছুরই অতিরিক্ততা ভালো নয়। তাই শেষপর্যন্ত দীর্ঘদিনের ঐশ্বর্যসন্ধান তাঁর কাছে যেন ফাঁকি মনে হয়। নায়কের অহং শেষপর্যন্ত বিত্ত, খ্যাতি বাড়ালেও মনের শূন্যতা পূরণ করতে পারল না। ফলে প্রাণ ব্যাকুল 'জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্য।' মনের মধ্যে হু হু করে উঠেছে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। অনেক সন্ধানের পর হারিয়ে যাওয়া অমিয়ার যখন সন্ধান মিলল, সে এক অন্য নারী, রাশিয়ার লক্ষ্মী খেদানো বাদুড়ের ঠোকর খাওয়া মহীভূষণের প্রেরণায় সর্বস্ব ত্যাগ করে সে তারই কাছে কল্যাণ ব্রতের দীক্ষা নিয়েছে। ভালোবাসার অমৃত তাকে নিয়ে গেছে বঞ্চিত মানুষের কাছে, তাদের মঙ্গালকর্মে।

'রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়' — ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হলে, রাশিয়ার জার শাসিত রাষ্ট্র, ব্যবস্থার অবসান হয় খেটে খাওয়া শ্রমিক-কৃষক মজুরের প্রোলেতারিয়েতদের সংগঠন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রশাসন কায়েম হলে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া তথা ধনিক শ্রেণি একে

সুনজরে 'দেখেনি'। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরূপ প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তাই বাইরের পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার সমর্থকদের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। বর্তমান মন্তব্য সেই মনোভাবের দ্যোতক। অমিয়ার বাবার আশা এ সব সাময়িক। কিন্তু দুদিনে অমিয়া হল তার শিষ্যা। পিতৃগৃহের নিরর্থক উপকরণের দুর্গ থেকে মহীভূষণ তাকে উদ্ধার করল।

অনুশীলনী — ৫

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৪২ পাতার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে ৪৯.২২-এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা একাধিকবার পড়ুন। সেখান থেকেই স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে

.....

থামতে পারিনে, ...।

.....

বুক ফুলিয়ে এগিয়ে .....।

খ) কর্মের নেশায় .....

এত কালের খাটুনি .....,

প্রাণ উঠল .....

জীবনের .....।

২) "তিনি চান অমৃত।" লিখুন ছত্রটির মূল উৎস ও সূত্র কী এবং কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

৩) 'দেখলুম অমিয়া'কে—অমিয়াকে কে কেমন দেখলেন, বর্ণনা করুন।

৪) অমিয়ার অন্য নারীরূপটির পরিচয় দিন।

৫) 'অমৃত' কবিতার ট্র্যাজিক চরিত্র কোন্‌টি ও কেন বুঝিয়ে লিখুন।

৬) 'ভারতের একজন নারী বলেছিলেন' — নারীটি কে? কী বলেছেন? কোথায় বলেছেন? সংক্ষেপে লিখুন।

৭) 'দেবনা তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান'— বক্তা কে? কাকে বলেছেন? কোথায় বলেছেন? সংক্ষেপে পরিণতি কী হয়েছে? আলোচনা করুন।

৮) 'এতকালের খাটুনি মনে হল যেন' — কার মনে হল? কী মনে হল? কেন মনে হল? ব্যাখ্যা করুন।

৯) নীচের উদ্ধৃতিটির ছন্দোলিপি প্রস্তুত করুন।

'এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।
আমি শুধালেম 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললে, 'জেলখানায়',

৪৯.১৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১) ক) চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা। / তরুশ্রেণী মসী-মাখা / গ্রামখানি মেঘে ঢাকা।

খ) যারে খুশি তারে দাও — / শুধু তুমি নিয়ে যাও

গ) মননশীল, জীবনদ্রষ্টা, নতুন করে, যৌবনোচ্ছ্বাস, প্রেমানুভূতির আদর্শ নিষ্ঠ।

ঘ) শেষ সপ্তক, শ্যামলী।

২) ক) ১৯১৬, খ) ১৯৩৬, গ) ১৯৪০, ঘ) শেষ লেখা

৩) কবিতা রচনা, ফাল্গুন ১২৯৮, কাব্যপ্রকাশ ১৮৯৪ (১৩০০)।

৪) কাব্যগ্রন্থ — পুনশ্চ, রচনাকাল — ১৯৩২ ।

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজনে ৪৯,৩ নম্বর অংশটি এবং ৬-৯ নম্বর প্রশ্নের জন্য ৪৯.৬ সংখ্যক অংশটি বারবার পড়ুন।

অনুশীলনী — ২

১) ক) কুটিল ফণা চক্ষের ; গুপ্ত বিষদন্ত, তীব্র বিষে।

খ) স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; প্রলয়মন্থন ক্ষোভে ; ভদ্রবেশী বর্বরতা ; পঙ্কশয্যা হতে।

গ) ব্রাহ্ম সমাজের, আচার্যের, পৃথিবীর মানুষ, আশ্রয়।

ঘ) জুলু বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধ, বক্সার যুদ্ধের।

২) ক) কাব্যের নাম, খ) ১৩০৭ সাল।

৩) তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলি হল ঃ-

ক) ব্রাহ্মধর্ম ও নীতিবোধ, খ) সমাজ, ইতিহাস ও দেশপ্রেম

গ) মনুষ্যধর্ম ও মানবিক আবেদনের কবিতা।

৪ থেকে ৮নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৪৯.১০ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ুন। এখানেই উত্তরগুলি আছে।

অনুশীলনী — ৩

১) ক) আরতি দীপ, সন্ধ্যা, রক্তজবার, রজনীগন্ধা

খ) আরাম চেয়ে, লজ্জা, অঙ্গ, ছেয়ে, রণসজ্জা।

গ) পূজা, বন্দনা, শঙ্খে-বিধাতার উদাসীন, সাড়া।

ঘ) চিরপথিক, গতিহীন, অধ্যাত্ম রসবোধ।

২) দুর্দিন, পতাকা, পূজার উপচার, মুখোমুখি হওয়া, জয়সূচক বাদ্য। ৩ থেকে ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্য নিন।

অনুশীলনী — ৪

১) ক) সংগ্রহ করেছিলেন দুর্গমের রহস্য, জল-স্থল-আকাশের, দৃষ্টি-অতীত, তোমার, চেতনাহীন।

খ) সকালে, সন্ধ্যায়, দেবতার, নামে ;

খেলছিল, মায়ের, সুন্দরের, আরাধনা।

২ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ভালো করে পড়ুন।

অনুশীলনী — ৫

১) ক) 'ততই আমাকে চলে ঠেলে।' ; 'থামাতে পারিনে তার তাড়না।' ; 'বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে' ; 'চলে আত্মশ্লাঘা'।

খ) 'ঝাঁজ এল ঘরে।' ; 'মনে হল যেন ফাঁকি' ; 'দুহাত বাড়িয়ে' ; সাঁচা সোনার জন্যে।'

২) মূল উৎস, রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অমৃত কবিতা, এর সূত্র হোল বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের তৃতীয় শ্লোক — ২/৪/৩।

মৈত্রেয়ী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৩ থেকে ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অংশ ভালো করে পড়ুন।

৯) ছন্দোলিপি ঃ

এসেছি তাঁর কাজে /

উপকরণের দুর্গ থেকে / তিনি করেছেন / আমাকে উদ্ধার।

আমি শুধালেম / 'কোথায় আছেন তিনি।'

অমিয়া বললেন, / 'জেলখানায়'।

এটি গদ্য কবিতার ছন্দ বা গদ্য ছন্দে লেখা। তাই প্রচলিত ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের নিয়মে এ কবিতাংশের ছন্দ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। প্রথম ছত্রের একটি মাত্র বাক্‌পর্ব থাকলেও দ্বিতীয়ে তিনটি এবং তৃতীয় ও চতুর্থে দুটি বাক্‌পর্ব আছে। ওইগুলি অর্থ বা ভাবকে অনুসরণ করে গঠিত হয়েছে। কবিতাংশটি পরস্পর অসমান আটটি বাক্‌পর্বে রচিত। এর ছত্রে ছত্রে বহমান একটি অন্তঃসলিলা ছন্দস্পন্দন আছে।

৪৯.২০ গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের — সোনার তরী, নৈবেদ্য, বলাকা, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (১-৪ খণ্ড)।

ড. সুকুমার সেন — বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ম খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ)।

ড. নীহাররঞ্জন রায় — রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।

ড. খনা মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়।

ড. বাসন্তী চক্রবর্তী — রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য।

ড. পম্পা মজুমদার — রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস।

ড. পবিত্র সরকার — ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ।